আর্জান সর্দারের নিশানা

মধুময় পাল

ভাগ্যধর গুণিন আর্জান সর্দারকে রেখে চলে গেল। বুঝে ওঠার সুযোগ পেল না জয়দেব। তখন পড়নবেলা। সূর্যের মধ্যে অল্প অল্প ভালোবাসা হয়েছে। নলবন হোগলাবনের বিস্তারে এখনও যে জল আছে তার ওপরের বাতাসে একটা নম্রতা আসছে। সন্ধের ঢল থেকে রামি রজকিনীর কোলের মতো নরম হয়ে যাবে এ-বাতাস। চৈত্রে এখানে এরকম হয়।

জয়দেব ভেবেছিল একটা রাত ভাগ্যধরকে রেখে ওর গুণিনগিরির নতুন কাহিনি শুনবে। ভাবনাটা ইচ্ছের মধ্যে থেকে গেল।

ভাগ্যধর জিগ্যেস করেছিল, পাথরের বাটি কোথায় পাব। অ্যালুমিনিয়ামের হতে পারে।

কাঁসার বাটি?

না। পেতলের ঘড়া?

উঁহু।

কুঁজো বা মাটির কলসি।

উঁহু।

সব প্লাস্টিক?

ওইরকম।

কী সস্তা জেবন বানিয়েছে কাহার! এক কি দশ হাজার বছর বাদে যখন ধস বেরবে মাটি খুঁড়ে, গেরস্থালির এক পিস মিলবে না যা বলতি পারে যে তোমাদের হাতের কাজের শখ ছিল, গাছ-ফুল-পাখির সঙ্গে বসবাস ছিল, জেবনের ভেতর ভালোবাসা ছিল। সব কংক্রিট আর প্লাস্টিক। দাম দিয়ে কী সস্তা জেবন বানালে মূর্খের মতো।

কিছু একটা আনো, আর্জানকে রেখে যাই।

আর্জানকে মানে...

আগে আনো। হাতে সময় নাই। পাতিপুকুর যেতি হবে। আমি তো আর তোমাদের মতো ফট্ করে গাড়ি চাপতি পারি না। ঝোলার ভেতর তেনাদের খুব কষ্ট হয়। দমবন্ধ হয়ে যায়।

ভাগ্যধরের ঝোলা, মানে ফকিরের আলখাল্লার মতো দুশো-তিনশো রঙবেরঙ কাপড়ের টুকরোর তাপ্পি-মাধ্যমে তৈরী ঝোলার ভেতর নাকি এক ডজন আত্মা আছে। গাছ, ফুল, পাখি, নদী, মানুষ, কুমির, এমনকি বাঘেরও। তিনটে বাঘ ছিল। একটা নাকি খুলনা

জেলার গুণকরকাটিতে পড়ে যায়। তুলতে গেলে সে দেশের সরকারিবাবুরা বাধা দেয়। সেই বাঘের আত্মা নাকি বাংলাদেশের মাটি ছুঁয়ে সে-দেশের সম্পত্তি হয়ে গেছে। সুতরাং নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পাচারের দায়ে অ্যারেস্ট করা হবে। অনুপ্রবেশকারী হিসেবেও ভাগ্যধরকে জেলে পোরা হতে পারে। এই হল ভাগ্যধরের 'তেনারা'।

বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। ঢের ঢের বুজরুকি জয়দেব পঞ্চাশ বছরের জীবনে দেখেছে। ইংরেজির মাস্টার মশাই বিজয় কাঞ্জিলালের সান্নিধ্যে আসার পর থেকে বিজ্ঞানের চোখ সব কিছু দেখার সেই যে শুরু, আজও তা টলেনি। আজ এই প্রস্তরযুগে, যখন পাথর দিয়ে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন চলছে অষ্টপ্রহর, রোজই নতুন নতুন জ্যোতিষীবাবা-খুড়োর উদয় হচ্ছে অন্ধ আকাশে, যখন টিভি-র পর্দায় পর্দায় বিখ্যাত পুরুষ-নারীদের পাথুরে আঙুল ভেসে উঠছে সযত্ন উদাসীনতায়, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের লোকজনও ধারণ করছে পাথরপ্রতিমা, আজ এই মন্তরযন্তরে, যখন বিস্তর বাবাজি-মাতাজি-দাদাজি-নেতাজি অশ্রাব্য মন্ত্র বেচছে চচ্চড়া দক্ষিণায়, দেবদাসদাসীদের মধ্যযুগ ফিরছে হইহই করে, জয়দেব কাহার কিন্তু বিজয় কাঞ্জিলালের দেখানো বিজ্ঞানের পথেই হাঁটে। বিজয় স্যার বলতেন, সব বুজরুকির মধ্যে একটা উচ্চস্তরের কৌশল থাকে। সেটা মজার। নিজে না ঠকে এবং ঘনিষ্ঠদের ঠকতে না দিয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারো। অবশ্য যারা ঠকবে বলে তৈরি হয়ে বসে আছে, তাদের ঠেকাবে কে?

জয়দেবের মনে পড়ে, বাবা তখন রোগে ভুগে ভুগে সকাল বিকেল নিজের মৃত্যু কামনা করছে, ধারে দেনায় ডুবেও বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়ে যাচ্ছে মা, কোনও চিকিৎসাই কাজে লাগছে না, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা গাদাগুচ্ছের টেস্ট করিয়ে করিয়ে রোগীর পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে এবং হরেক ল্যাবের কমিশন খেয়ে নিজেদের সঞ্চয় আরও মোটা করে দিশাহীন অবস্থায় কণফিডেন্টালি আরোগ্যের কথা বলে যাচ্ছে, সে সময় বাড়িতে পাকতেড়ে চেহারার এক রক্তবাস সাপুড়ে এল। বলল, এই বাড়ির নীচে জোড়ভাঙা বাস্তুসাপ আছে। জোড় নষ্ট হয় ভিত গড়ার সময়। তারই শ্বাস-প্রশ্বাস লেগে বাবাজির অসুখ। মা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সাপুড়ের পায়ে। কান্নাভাঙা গলায় বলেছিল, আমার স্বামীকে তুমি ভালো করে দাও, বাবা! উনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। বাস্তুসাপের রোষ কমাতে তুমি যা বলবে, আমি করব। আমার সব গেছে। যেটুকু আছে, তাই দিয়ে শান্ত-স্বস্ত্যয়ন করব। ওনাকে সুস্থ করে দাও। জয়দেবের মনে আছে, ঘরের মেঝেয় লাল কাপড় বিছিয়ে, দু-দুটো সাপের ঝাঁপি খুলে দু পাশে রেখে, কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে চকচকে কালো দুটো জাত সাপ, দরজা জানালা বন্ধ করে, ঝাঁপি দুটোর মাঝখানে ছোট্ট একটা খুলির মাথায়, সম্ভবত শিশুর করোটি, মোমবাতি জ্বেলে, মোমের আলো সাপের কালো

গায়ে নড়ে চড়ে, রক্তবাস সাপুড়ে রক্ততিলকের দু পাশে চোখ ভাটার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে বিড়বিড় করে, তার টানটান শিড়দাঁড়ার ওপর লম্বাচুলের মুণ্ডু দোলে, আয় মা সর্পেশ্বরী মনসা মা বিষধরী, মা নাগিনী কালনাগিনী আরও যত ফণী বিষনিঃশ্বাসিনী, যেটুকু বোঝা গিয়েছিল আর কী, সব স্ত্রীলিঙ্গ, বোঝা যাচ্ছিল না কথিত বাস্তুসাপটা মেল না ফিমেল, মা তখন পুরোপুরি আউট, সর্পধারিণী দর্পহারিণী কালকুণ্ডলিনী, নারীবাদী মন্ত্র নাকি, মা এই ঝাঁপিতে তোমার বাঁ হাত রাখো, বাস্তু সাপ পুরুষ, তুমি স্পর্শ করো, ক্ষমা চাও, তার যন্ত্রণার কাছে নিজেকে নিবেদন করো, বলে কী বাঞ্চোৎ, ভয় কী মা, হাত রাখো, এবার মা শিউরে ওঠে, সাপুড়ে মার আঙুল ধরে টেনে কুণ্ডলী পাকানো সাপের গায়ে রাখে, মন্ত্র পড়ে, তারপর হাত সরিয়ে দেয়। জয়দেবের মনে আছে, মা ঘামছিল। মনে আছে, সাপুড়ে বলেছিল, তোমার ছেলে আমাকে জোচ্চোর ভাবছে। পাশের ঘরে বাবার পাশে বসে জয়দেব দেখছিল। সাপুড়ে বলল, কামাক্ষ্যাপীঠের বীজবস্ত্র দেব মা? অষ্টধাতুর তাবিজে বাবার বাঁ হাতে পরিয়ে দেবে। বাস্তুর শান্তি হয়েছে। বাইরের বিষবাতাস আর কখনও বাবার গায়ে লাগতে দেবে না এই বীজবস্ত্র। কামাক্ষ্যার তন্ত্রসিদ্ধ কাপড় গো মা, সবাইকে দিই না, যে ঘরে ভক্তি আছে সেই ঘরে দিই, কামাক্ষ্যাপীঠে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকে পাঁচ ছ হাত বস্ত্র গেরস্থদের কল্যাণে, অনেক খরচ লাগে, অনেকে অনেক দাম দিতে চায়, গুরুর মানা আছে, অসাধু ঘরে দিবি না, শয়তান-বদমাশরা পচে হেজে মরুক, যারা মানুষের ক্ষতি করে তাদের পচন ধরুক, গুরু বলেছেন, মানুষ বুঝে দিবি, সৎ বুঝে দিবি, আপনি মা ৫০১ টাকা দিবেন, বিশ্বাস হলে দিবেন, না হলে দিবেন না, বাবার জন্য এই খণ্ড বার করেছি, আমি এখন রেখে যাচ্ছি, আপনি আমাকে স্মরণ করলেই হাজির হব। জয়দেব এরপর কী করেছিল, মনে আছে। অনেক উপভোগ হল, এবার মালটাকে কাটাতে হয়, নয়ত মা টাকাটা দিয়ে দেবে। জয়দেব বলেছিল সাপুড়েকে, ক্লাবের ছেলেদের খবর দেব? লাইটপোস্টে বেঁধে প্যাদাবে। চুল-দাড়ি সব ওপড়াবে। এখন ওদের হাত ফাঁকা, কর্মসূচি নেই। সাপ কেড়ে নিয়ে বেচে দেবে। কেটে পড়ো, দাদা। ৫ টাকা দিচ্ছি। বেশ মজা দিয়েছ। দারুণ অ্যাকটিং করো। তার দাম। এবার ফোটো। মা হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, এ কী করছিস। কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হয় জানিস না? লেখাপড়া শিখে নাস্তিক হয়েছ? নিজের সংসারে নাস্তিকগিরি দেখিও। আমার সংসার আমাকে করতে দাও। সব ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি, আশা করি বুঝবে।

বুজরুগির খবর পড়তে দারুণ লাগে জয়দেবের। কী সাহসের, কী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিখুঁত অভিনয় করে যায় লোকগুলো, কী অক্লেশে মিথ্যে বলে যায়, এতটুকু মানসিক বিচ্যুতি নেই, এতটুকু শিথিলতা নেই লজ্জা বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই, এক

জায়গায় ধরা পড়ে অম্লানবদনে পরের জায়গার জন্য তৈরি হয়, কী অসামান্য দক্ষতায় সভ্যতার সব সংজ্ঞা নস্যাৎ করে তারা নিজের বয়ানে স্বাস্থ্যসম্মত করে নিজের কর্মধারাকে, তারা শিকারকে খায় ঘিলু থেকে। বুজরুগরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দেশি-বিদেশি ইত্যাদি প্রকারের হয়। জয়দেব কোনওদিন বুজরুগদের নিয়ে বই হয়ত লিখবে। তাতে অবশ্যই একটা বড় অধ্যায় থাকবে 'পোলিটিকাল বুজরুগ'।

ভাগ্যধরও বুজরুগ। কিন্তু সে নিজে সেরকম জানে কিনা সন্দেহ হয়। লোকে বলে, ভাগ্যধর অশুভ আত্মা তাড়াতে পারে। অশুভ শক্তি বিকল করে দিতে পারে। ভাগ্যধরও সেরকমই জানে। গুরু কদম শা-র কাছে সে যে মন্ত্র ও আচার শিখেছে, সে সবের অব্যর্থতা সম্পর্কে তার কোনও সন্দেহ নেই। তবু মাঝে মাঝে অঘটন ঘটে। সাপে কাটা মানুষ মরণে ঢলে পড়ে। মন্ত্র পড়া চাল চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলে চোর। জল-পড়া খেয়েও ঘুমের মধ্যে বাচ্চার পেচ্ছাব বন্ধ হয় না, বন্ধ হয় না কিশোরীর সাদাস্রাব। ললিত মুদির লিঙ্গপচা ঠেকানো যায়নি মন্ত্র-পড়া বোধকুমারী পাতার পুলটিস দিয়ে। দেওয়ানের ঘাড় থেকে নারানির ভূত নামানো যায়নি, শেষে কিনা বড় হাসপাতালে পাঠাতে হল। গত বছর দুটো মউলিকে বাঘে খেল। তবু মন্ত্রের জোরে বিশ্বাস রাখতে হয় ভাগ্যধরকে। বিশ্বাস হারালে মানুষের ভালো সে করবে কীভাবে? মানুষ যে আরও অসহায় হয়ে পড়বে। মন্ত্র তাকে দু বেলা দু মুঠো খাবার জোগায়, মানুষকে দেয় ভরসা। তাই সে আরও জোরে মন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে।

অনেক কাল বাদে ভাগ্যধরকে দেখল জয়দেব। বছর দশেক তো হবেই। সুন্দরবনের ওপর ডকুমেন্টারি করবে বলে দুটো ছেলেমেয়ে তখন জয়দেবকে ধরেছিল। কীভাবে তারা যেন জেনেছিল জয়দেব কাহার মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া পরিবারের লোক। সুন্দরবনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ভেবে এসেছিল। দুঃসহ কষ্ট স্বীকার করে মরিচঝাঁপিতে বসত গড়ে তোলা উদ্বাস্তুরা পুলিশের বর্বর অত্যাচারের মুখে উৎখাত হয়ে আর যোগাযোগ রাখেনি সেই দ্বীপের সঙ্গে। অন্তত জয়দেব কাহারের মা-বাবা তো রাখেইনি। কয়েকশ মানুষ মরেছিল জল না পেয়ে, খেতে না পেয়ে, গুলি খেয়ে, জলে ডুবে। সে-সব কাহিনী অনেকটাই জানা আছে জয়দেবের। কিন্তু শোনবার কেউ নেই। ডকুমেন্টারির ছেলেমেয়ে দুজনও শোনেনি। তবু সে হিঙ্গলগঞ্জে অধী পালের কাছে নিয়ে যায় তাদের। সেখানেই দেখা হয় ভাগ্যধর গুণিনের সঙ্গে। ছ ফুটের ওপর লম্বা। এক মাথা কোঁকড়ানো, কাঁধ অবধি লম্বা চুল। দাঁড়ের মতো কঠিন হাত। হালের মতো চওড়া বুক পিঠ। কোদালের মতো পা। ভুষো কালোগা। ঝকঝকে দাঁতে দরদী হাসি। আর মায়াবী চোখ। এই হল ভাগ্যধর গুণিন। অধীর পাল পরিচয় করিয়ে দিল।

আজ ভাগ্যধরকে দুর থেকে একবার দেখেই চিনে ফেলেছে জয়দেব। নলবনের ১৪ নম্বরে ভিড়ের ওপর জেগেছিল ওই মাথা। অবাক হয়েছিল ভাগ্যধর। হঠাৎ এই নলবনে কেন? জলা বুজিয়ে, ক্ষেত উঁচিয়ে এখানে আবাসন হচ্ছে মাইল মাইল। এখানে অশুভ শক্তি আসতে পারে না, থাকতে পারে না। কারণ এক, সব বাড়ি বাস্তু করা আছে বা হচ্ছে। কারণ দুই, শোনা যায়, সমাজের শুভ শক্তি এই সব বাড়ি বানিয়েছে, বানাচ্ছে। হ্যাঁ, সাপে কাটতে পারে। যেখানে সেখানে যখন তখন জাত সাপের আক্রমণাত্মক আবির্ভাব ঘটছে। চেয়ারে পা ঝুলিয়ে নিশ্চিন্তে বসতে পারছে না লোকজন, শান্তিতে ঘুমোতে পারছে না। যত না দেখা যাচ্ছে গপ্পো রটছে ঢের বেশি। সাপের কথায় সদ্য শোনা একটা রসিকতা মনে পড়ে জয়দেবের। মুম্বইয়ের একটা বাড়িতে সাপ ঢুকেছে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত এলাকার বাড়িতে। দেখেছে দারোয়ান। দোতলায় ওঠার মুখে দেখতে পায়। সে চিৎকার করতে করতে পালায়। তারপর সাপটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরে ঘরে আতঙ্ক। থানায় ফোন। সবাইকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলল আবাসন কমিটির চেয়ারম্যান। রাস্তায় নেমে এল সবাই। পুলিস এল। বন দপ্তরে খবর দিল। বন দপ্তর সাপুড়ে খুঁজতে বেরল। এসব দেখে শুনে বনারসী দাস পানওয়ালা কত্থার (খয়ের) ঘটি চকচকে করতে করতে বলল, আমার চচেরা ভাইয়ের গায়ের ওপর দিয়ে সাপ গিয়েছিল। ও তখন তিন মাসের। উঠোনে চেটাই পেতে ওকে শুইয়ে রেখেছিল ওর মা। সেই চচেরা ভাই এখন মুম্বইয়ে ছ-টা ফ্ল্যাটের মালিক। সিনেমায় টাকা লাগায়। দুবাইয়ে জলসা করে, উটিতে হোটেল খুলছে। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বনে গেছে। আর আমি চুনাগলিতে পান বেচি। সাপটা যদি আমার গায়ের ওপর দিয়ে যেত, আমি সিনেমায় টাকা লাগাতাম, নায়িকাদের হ্যান্ডবগলে নিয়ে হাঁটতাম, পলিনেশিয়ায় উইক এন্ড কাটাতাম, পিকিংয়ে মোটেল বানাতাম। লাইফ হো তো অ্যায়সা। বহিনচোৎ সাপটা আমার গায়ের ওপর দিয়ে গেল না। মাকে দোষ দিই না, মা কোশিশ করেছিল। বনারসী দাসের কথা চাউর হওয়ার পর ঘরে ঘরে কোশিশ চালু হয়েছে কিনা জানা নেই জয়দেবের। কিংবা ভাগ্যধর সেরকম পেশা, মানে বাচ্চাদের গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চালানের পেশা নিয়েছে কিনা জানা নেই জয়দেবের। তার চোখে আছে, সাপের গায়ে হাত রেখে মা ঘামছে।

ভাগ্যধরকে ঘিরে থাকা ভিড়টা হঠাৎই পেছনে সরে গেল। যেন ভাগ্যধরের সামনে ফাঁকা জায়গা দরকার। খুব একটা ফাঁকা জায়গা কোথাও নেই যদিও। গা ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি উঠেছে, উঠছে। নাকের দুটো ফুটোয় মাঝখানে পাতলা হাড়ের যে স্পেস থাকে সেটাও নেই অনেক জায়গায়। ভাগ্যধর লম্বা পা ফেলে এগোতে এগোতে থেমে গেল। পা জোড়া করে শালখুঁটির মতো খাড়া হয়ে আকাশের দিকে তাকাল। মুঠো করা ডান হাত সামনের

দিকে কাঁধ বরাবর তুলে চোখ বড় করল। ওর ঠোঁট কাঁপল। শরীর বাঁ দিকে ঘোরাল, কুচকাওয়াজে যাকে বলে 'বাঁয়া মুড়', রাস্তাটা সেদিকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে জয়দেব। জোড়া পায়ে তিনবার লাফ মারল ভাগ্যধর। তারপর উবু হয়ে শুয়ে সরীসৃপের মতো বুক ঘষে খানিকটা এগোল। আবার খাড়া হয়ে মুঠো-করা ডান হাত বাঁ কাঁধের ঝোলার ভেতর ঢুকিয়ে দিল। পেছনে ভিড়-করে-থাকা জনতার উদ্দেশ্যে বলল, আপনারা যান। আর ভয় নাই। শান্তিতে থাকেন। আনন্দে থাকেন। কদম শা-র শিষ্য যথা ভাগ্যধর গুণী/গুরুর কৃপায় চলে, অন্যে না শুনি/গুরুর আজ্ঞায় কুম্ভীর হয়্যাছে পার/হাস্যমুখে থাকো সবে জলের বিস্তার।

এরপর মুখ ঘোরাতেই জয়দেবের চোখাচোখি। ভাগ্যধর নিষ্পলক দেখে জয়দেবকে। কয়েক মুহূর্ত। প্রথমে অবাক হওয়া, তারপর যেন একটু খুশি হওয়ার ছায়া খেলা করে মুখে। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, চেনা চেনা লাগে নয়! দেখেছি কি কুনোখানে! কার বাড়ি যেন ভাসা ভাসা আসে। কার মুখ কার...। বলতে বলতে চিৎকার করে ওঠে, জয়দেব কাহার। মরিচঝাঁপির ছেল্যা। হাসনাবাদে ছিলা। অধীর পাল। তা সেই বিটাবিটি দুটা গেল কই? সিনামা করবে বইল্‌ল। কত ছবি তুইল্‌ল। পোছ দিলাম কত। খালপাড়ে, জঙ্গলে নে গেলাম। গেল ত গেল। টিবি-তেও দেখালোনি। তুমার সঙ্গে কথা হয়?

বুঝতে অসুবিধে হয় না জয়দেবের, সেই ডকু-র ছেলেমেয়ে দুটোর কথা বলছে। তাই তো বলার কথা। সেই সূত্রে আলাপ। সেই দুটো দিন একসঙ্গে ছিল এরা অধীর পালের বাড়িতে। তারপর জয়দেব চলে আসে। ওরা ছিল। জয়দেব বলে, আমি তো চলে এলাম। ওরা কিছু করেনি।

করল। কাজের কাজ হলটা কী? সবাই বইলছিল, ফোকটে কাম করতি যেওনি ভাইগ্যধর। উরা লাখ লাখ টাকা পায়। পার্টি ধরে, মিনিস্টার ধরে টাকা খিঁচে ল্যায়। আর গরীব মানুষকে ঝালমুড়ির ঠোঙা ঠ্যাকায়। উয়াদের বুজরুগি বুঝ না। ছাড়ান দাও। শালা যত বাঁচি তত দেখি যে চারদিগেতে ঠগ আর ঠগ। নিজে ঠগ না হলি কষ্ট পেতি হয়। ছাড়ো ইসব ফালতু কতা। তা তুমি ইখানে কী ব্যাপার?

জয়দেব বলে, ঘর বানিয়েছি।

ইখানে? ইটা তো রাজরাজড়ার জায়গা হে। জমির দাম শুনি লাখ লাখ টাকা।

এখন হয়েছে। পাঁচ বছর আগেও সস্তা ছিল।

কত ছিল?

পনেরো কি বিশ হাজার টাকা কাঠা।

এখন কত?

পাঁচ লাখ, সাত লাখ। আরও দামি আছে।

কী করি হল?

চলো, এই ভেড়ির ওপারে আমার ঘর। যেতে যেতে বলি।

উখান থেকিই তো এলাম।

আরেকবার চলো। ঘরটা তো দেখবে, নাকি!

ছিঁড়ে-যাওয়া ভিড়টা আবার খানিক জোড়া লাগে। ওঝার সঙ্গে খালপাড়ের লোকটার খাতির দেখে ওরা অবাক হয়। ভাবে, এই লোকটাও কি তুকতাক জানে, গুণ জানে? ডেঞ্জারাস। তাহলে তো সম্‌ঝে চলতে হয়। লোকটা দেখতে ভ্যাবলা মতন। ওর চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ছদ্মবেশে থাকে। হাতে অনেক ক্ষমতা। বাণ মেরে পেটের বাচ্চা নষ্ট করে দিতে পারে।

জয়দেব বলে, বাঁ দিকে, ডান দিকে যে শহর হচ্ছে দেখছ, সব চাষজমি ছিল। অধিগ্রহণের পর জমির দাম বেড়ে গেল হু হু করে।

অধিগেরণ মানে?

উচ্ছেদ। নিজেদের জমি থেকে উচ্ছেদ হল লোকজন।

তারা কুথা গেল?

ঝিলের ওপারে আরও ভেতরে, কাটাডাঙ্গা , পাঁচমুণ্ডী, অকালমেঘ, আরও অনেক গ্রাম আছে, সেখানে। মাঠের কাজ করত যারা, তারা এখন কেউ বাসর কন্ডাক্টর, কেউ রিক্সা চালায়। কেউ স্টেশনে বাজারে কুলি খাটে, কেউ দারোয়ান হয়েছে। মেয়ে-বউরা ঝি খাটে। খারাপ কাজও করে।

বেবুশ্যে হইছে?

পেট চালাতে হবে তো।

ছিঃ।

অধিগ্রহণের জমিতে দু-চারটা বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হতেই, আর চওড়া পিচের রাস্তা হতেই, আশপাশের জমির দাম লাফাতে লাগল। বুঝলে কিছু?

বুঝলাম। সুন্দরবন যিভাবে শহর হতিছে।

তা তুমি হঠাৎ এখানে কেন?

কুমির!

কুমির?

হুঁ। এই ভেড়িতে। কাল রাতে মাচায় উঠে পাহারাদারকে নিছে।

কী বল?

আগেও নিছে। আদিল শেখ খেজুর গাছ থেকি নামতিই হ্যাঁচকা টানে কুথা যে নিল, বড়ির এক পিসও মিলে নাই। ভবানী সা-কেও নিল। ওর ডান হাতটা কাঁটাঝোপে পড়ি ছিল।

ভবানী সাহার কেসটা জানে জয়দেব। আদিল শেখের ব্যাপারটা জানে না। ভেড়ি দখল ও জলা বুজিয়ে প্রোমোটারির অতি-গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে এলাকা এখন মুক্তাঞ্চল। কত কুমির আসবে! জয়দেব ভাবে।

কুমিরটাকে রক্তবীজে পুরে দিইছি। সব মস্তানি শেষ। থাক্ আমার ঝোলার ভিতর নিস্তেজ মেরে। ভাগ্যধর বলে।

মাদারির খেলা দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিল জয়দেব। সাত কি আট বছরের তখন। ছুটে পালিয়ে আসে ঘরে। মাকে ধরে কাঁপছিল। মা জানতে চায় কী হয়েছে। জয়দেব বলতে পারে না। দুপুরে জ্বর আসে। ধুম জ্বর। জ্বরের ঘোরে ও নাকি মাঝে মাঝেই রক্ত, ছুরি, রক্ত বলে চিৎকার করছিল। ডাক্তার নাকি বলেছিল, কিছু একটা দেখে ও মেন্টালি শকড্। জ্বর কমে যাবে, ট্রমা কাটতে সময় লাগবে। একা রাখবেন না। আসলে যা হয়েছিল, মাদারির বাজিকর তার দলের একটা ছেলের জিভ কেটে ফেলে ভয়ঙ্কর চকচকে ছুরি দিয়ে, কাপড় ঢাকা শোয়ানো ছেলেটা দাপাতে থাকে, রক্তে ভেসে যায় কাপড়, বাজিকরের দু আঙুলে ধরা সদ্যকাটা জিভ নড়ে, তার থেকে চুঁইয়ে পড়ে রক্ত, রক্ত মাখা ছুরির গায়ে রোদ চমকায়। শুনে মা বলেছিল, কেন যাস ওসব দেখতে? তুই একটা আস্ত ভোঁদাই। জাদু খেলাও দেখতে জানিস না। কী যে হবে তোর। কে আগলে রাখবে সারা জীবন।

কথাগুলো মনে পড়ে জয়দেবের। এখন আর জ্বর আসে না। কত জাদু, কত বুজরুগি, কত ধাপ্পা— সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। কীভাবে যেন হয়ে গেছে। কত রক্ত, ছুরি, ছিন্নদেহ, আর্তনাদ, আগ্নেয়াস্ত্র— সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। কীভাবে যেন হয়ে গেছে। এখন আর জ্বর আসে না।

জয়দেবের বাড়ি ভালোই লাগে ভাগ্যধরের। বলে, গাছপালা দে ছায়া ছায় করিছ ঘরগুলো। ইখানে গাছ সাবাড় করি বসতি হইছে। এককালে জঙ্গল ছিল, বাঘের চলাচল ছিল কে বিশ্যেস যাবে? কী কাম পুরান কতায়। কত কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। অভাবিত দেখা। হিঙ্গলগঞ্জে যাও? অধীর পাল কেমুন আছেন? পালদার বড় জামাই নাকি আমেরিকা আছে? ছোট মেয়ের বিয়া হল? তোমার ছেলেমেয়্যা কী? আরও নানা সাংসারিক কথায় মেতে ওঠে ভাগ্যধর।

ভাগ্যধর বলে, কিছু খেতে হবে তো। আমি স্টেশনের হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি। তোমাকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিই।

ভাগ্যধর বাধা দেয়। উসব ঝামেলিতে কাম কী? তোমার বউ থাকলি বলতাম দুইটা রুটি করি দাও। বউ নাই, বলা নাই। দুপুরে ভাত খেলি শরীরটা ভ্যাদ ভ্যাদ করে। ডেম্প-লাগা ঢাকের মতন। বাজতি চায় না। ঘরে মুড়ি আছে। তাই দাও। তেল দাও। লঙ্কা আর আদা দাও। যদি পারো, পরে এক গ্লাস চা দিও কড়া করে।

ভাগ্যধর মুড়ি খেতে খেতে ঝোলার ভেতর থাকা গরান গাছের আত্মার কথা বলল। জানাল, গাছটা জাগ্রত। এই গাছে বন বেঁধে কখনও বিপদে পড়েনি ভাগ্যধর। পাশ দিয়ে বাঘ হেঁটে গেছে, মানুষের গন্ধ পায়নি, দেখা তো দূরের কথা। বাঁধনের ভেতর থাকা গোখরো সাপও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেই গাছের শক্তিকে ক্রিমিনালরা বাজে নোংরা কাজে খাটাচ্ছিল। রাগে দুঃখে ভাগ্যধর তার আত্মা বীজ করে ঝোলায় ভরে রেখেছে। আত্মাই শক্তি। গরান গাছটা থাকলেও সেই শক্তি নেই। ক্রিমিনালরা যতই পুজো করুক, সব ফুস্। এবার নোংরা বাজ করতে গিয়ে যে কোনওদিন মরবে। প্রোটেকশনটাই তো নেই। সেটা ভাগ্যধরের ঝোলায়। জয়দেবের বাড়ির উঠোনে এক রাতে গরান হাজির করে দেখাবে বলে নিজেই কথা দিল ভাগ্যধর। বলল, সেই জাগ্রত গরানের পাশে বাঘ কেমুন ভোটে-হারা মিনমিনে বাবু হয়ে যায় দেখাব। হ্যাঁ, বাঘ আনব উঠানে।

এর পরই ভাগ্যধর পাতিপুকুর যেতে হবে বলে আর্জান সর্দারকে রাখার জন্য একটা পাথরের বাটি চায়। জয়দেব খুঁজে পেতে সেরামিকের ছোট ফুলদানি বের করে। তাতে একটা বীজ, কে জানে কীসের, রাখে ভাগ্যধর। বলে, বড় রগচটা। উল্টাপাল্টা শুনলে ফট্ করে রেগে যায়। উকে নিয়ে পাতিপুকুর যেতি চাই না। একটা রাত তোমার ঘরে থাক। কাল সকালে ফেরার পথে নি যাব।

কিছুক্ষণের জন্য গোটা পরিস্থিতি জয়দেবের কথা বলার বাইরে চলে গিয়েছিল। বিশ্বাস করার প্রশ্নই নেই, কিন্তু অবিশ্বাস করে ভাগ্যধরকে আঘাত করা যায় না। পড়নবেলার পথে নিজেরই লম্বা ছায়া অনুগামী করে হনহনিয়ে পশ্চিমে হেঁটে গেল ভাগ্যধর।

ফুলদানিটা ঘরে নিয়ে এল জয়দেব। কোথায় রাখা যায়? জানালার কাছে রাখা ঠিক হবে না। বেড়াল লাফ দেয়। টেবিলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু যা ময়লা হয়ে আছে। বরং বুকশেলফে রাখাই ভালো। জায়গাটা পরিষ্কার। পড়ে যাওয়ার ভয়ও নেই।

সেই আর্জান সর্দার। একদিন জয়দেবকে আচ্ছন্ন করেছিল যাঁর জীবনী। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল টারজানের কীর্তিকলাপ। বারবার সে জীবনীটা পড়েছে। আর্জানকে ছুঁয়ে থেকেছে। আজও থাকে। তাঁর মুখ ভাসে।

জয়দেব শিবশঙ্কর মিত্রের বইটা নিয়ে সেই জায়গাটা পড়তে শুরু করে: 'ভাল করে চেয়ে দেখি, ওর হাতে বন্দুক।... কাছে আসতেই দেখি, কাপালিকের চেহারার কোনই

সাদৃশ্য নেই। রক্ত তিলক চিহ্নিত, দীর্ঘ কপাল সমন্বিত, প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু, তেজদৃপ্ত চেহারা— কিছুই না। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, সুন্দর শান্ত চেহারার মানুষ। মুখে বিরাট একজোড়া তামাটে গোঁফ। থুতনিতে চোট করে কাটা পাতলা পাকা দাড়ি। মাথায় বড় বড় আধপাকা চুল। দীর্ঘ কপাল। অভিজ্ঞ জীবনের তিনটি স্পষ্ট বাঁকা রেখা যেন কপালে খোদাই করা। ছোট্ট দেহ। সুঠাম কিন্তু সবল নয়। চোখে কোনও চঞ্চলতা নেই, কোনও কপটতা, কোনও হিংস্রতা নেই। শান্ত স্থির দুটি বড় বড় চোখ। অপলক দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে না আছে শঙ্কা, না আছে বিস্ময়। গায়ে গামছা। পরনে লুঙ্গি, আঁট করে পরা।'

ঠক শব্দ হল একটা। টেবিলে বই রেখে পড়ছিল জয়দেব। খানিক দূরে বাঁদিকে বুকশেলফ। শব্দটা সেদিক থেকে। দুটো টিকটিকি হয়ত ঝগড়া কিংবা অন্য কিছু বাঁধিয়ে ছোটাছুটি করছে কিংবা...

জয়দেব পড়ে যায়: 'কথা নেই বার্তা নেই, নৌকার উপর বন্দুকটি রেখে এক ধাক্কা মেরে নৌকা ভাসিয়ে গলুইতে বসে পড়ল।'

আবার শব্দটা হয়। এবার একটু জোরে। জয়দেব তাকায়। তাকিয়ে সে আঁতকে ওঠে। চোখের মণি স্থির হয়ে যায়। মুখ হাঁ হয়ে যায়। মেঝেয় বসে আছে বিরাট তামাটে গোঁফ আর বড় বড় আধপাকা চুলের সেই আর্জান সর্দার। সুন্দর শান্ত চেহারার আর্জান সর্দার। কোলে সেই বন্দুক।

বলেন, ভয় পেয়ে গেলে নাকি? তুমি তো সাহসী হে। একটা ভিতু লোক আমার জীবনী পড়বে কেন?

কষ্টে সৃষ্টে এদিন ওদিক থেকে দু-চারটে শব্দ জোগাড় করে জয়দেব বলার চেষ্টা করে, না, মানে, আপনি, আপনি তো... আমি...

মানে, তুমি ভেবেছ আমি নেই। তাই তো? দেখো, ওখানে লেখা আছে, এই ছোট্ট দুর্জয় মানুষটি আজও হয়ত ঘুরে বেড়ায় মাথায় গামছা জড়িয়ে, হাতে বে-পাশী বন্দুক ঝুলিয়ে, স্থির সন্ধানী অপলক দৃষ্টিতে— সুন্দরবনের রন্ধ্রে, বাঘের আঁটি ও ঘাঁটির সন্ধানে। তুমি এরকম 'ঠিকই' ভেবেছ। আমি আছি, আবার নেই। তুমি আমার ভক্তমানুষ, তোমাকে রহস্যটা বলা যায়। তোমার ভাগ্যধর গুণিন মানুষটা ভালো। চাল মেরে চপ্ খায় না। চাল মেরে মোটা চালের ভাত পায়। একদিন ভাগ্যধর আমাকে প্রস্তাব দিল, আর্জানদা, তুমি সারেণ্ডার করো। তোমাকে আমি ঝোলায় রেখে দেব। যেদিন ইচ্ছে করবে, বাইরেটা ঘুরিয়ে দেব। তুমি থাকলে না, আবার থাকলেও। ভাবলাম, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বনে বাঘ আর নেই। খুব বেশি দু-দশটা আছে। ওই কটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার গুণে একশ-দেড়শ দেখানো হয়। জাল রেশন কার্ড যেমন হয়। বাঘ নেই তো আমার কাজও নেই।

খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধে। চাষবাস পারি না। জল-টল খুব খারাপ। পেটের গোলমাল লেগেই আছে। রাজি হয়ে গেলাম ভাগ্যধরের প্রস্তাবে। ও আমাকে বীজে ভরে ঝোলায় রাখল। মাঝে মাঝে হাঁফ ধরলে বেরিয়ে পুরনো জায়গায় ঘুরে আসি। বুঝলে, এই হল নেই তবু আছি।

জয়দেবের অবস্থা করুণ। কী অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য বাস্তবে পড়েছে সে। না পারে মানতে, না পারে ফেলতে।

আর্জান সর্দার বলেন, ভাগ্যধর মানুষটা ভালো। আমাকে মান্যি করে। একবার ফিরতে দু দিন দেরি করেছিলাম বলে রাগ করেনি। বরং আর্জানদার জন্য ওর দুশ্চিন্তা হয়েছিল।

নলবন হোগলাবনের ওপর দিয়ে নরম বাতাস আসে। রূপকথার রাজকুমারীর ঘরের জানালায় উড়ন্ত পর্দার মতো নরম। রাধার বুকে কৃষ্ণের আলপনা আঁকার তুলির মতো নরম।

আর্জান সর্দার বলেন, ভাগ্যধর মানুষটা ভালো। কিন্তু আজ কেন যে কুমির ধরার ঢপ্ দিল। আসল কুমিরটা তো ধরল না।

আসল কুমির?

হ্যাঁ, ওখানেই ছিল। ঝোলার ভেতর থেকে আমি দেখেছি। ব্যাটা জলা বোজাবে বলে খুনখারাবির পথ ধরছে। পাহারাদারকে তো ও-ই মারল। ভেবেছে আমরা কিছু বুঝি না। সকাল থেকে পরিবেশ নিয়ে লম্বা লম্বা ভাষণ দিল। তারই মধ্যে প্রোমোটারের কাছ থেকে কমিশনের হিসেব বুঝে নিল। মটকা গরম হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম দিই ব্যাটাকে ঝেড়ে। ভাগ্যধর হারামিটাকে ছেড়ে গেল কেন বুঝলাম না।

দূর থেকে হাওয়ায় শ্লোগান আসে: 'দিচ্ছি না, দেব না। জলা বোজাতে দিচ্ছি না, দেব না। রুখছি, রুখব। প্রোমোটার-ঠিকাদার রুখছি, রুখব।'

আর্জান সর্দার উঠে দাঁড়ান। জানালা দিয়ে দেখেন। চোখ অভ্রান্ত করে দেখেন। শরীর স্থির। শুধু লম্বা আধপাকা কয়েকটা চুল বাতাসে নড়ে। ফিসফিসিয়ে বলেন, ওই মালটা।

দ্রুত হাতে বন্দুক তুলে নেন। একটা গুলির শব্দ। দূরে আর্তনাদ।